অনুসন্ধান

(গল্পগ্রন্থ – অনুসন্ধান)

নারাণ মাস্টার সকালে উঠে স্ত্রীকে চা দিতে বললেন। স্ত্রী মনোরমা বললেন,—চাও নেই, চিনিও নেই। দুধ তো দিয়ে যায় নি গোয়ালা। দু-মাস তাকে টাকা দেওয়া হয়নি। তুমি সংসারের কিছুই দেখ না। আমি কি করে একা সংসার চালাই ?

বাইরে থেকে ছেলেরা বললে, বাড়ি আছেন স্যার ?

নারাণ মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে স্ত্রীকে বলেন, একটু করে দাও যা হয় করে। ওরা সব এসে গেল।

মনোরমা মুখঝামটা দিয়ে বলেন, এসে কি হবে ? শুধুঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তোমার হয়েছে তাই।কারো কাছে পিত্যেশ নেই, ওদের পেছনে ভূতের মতো খাটুনি। এর চেয়ে টুইশানি ধরলে তো কাজ হয়, দু-পয়সা আসে।

বাইরে একখানা চালাঘরে গ্রামের চাষাভুষোদের অনেকগুলো ছেলে জুটেছে। নারাণ-মাস্টার তাদের কাউকে অক্ষর পরিচয় করান, কাউকে ভাঙা একটা গ্লোবে ভূগোল শেখান, একজনকে কবিতা পড়তে শেখান। একটি গরিব ছেলেকে বলেন,—কি খেয়ে এসেচিস্ সকালে ?কিছু না ? শোন্, তোর কাকীমার কাছে গিয়ে বল দুটি মুড়ি দিতে। আমি বলে দিয়েচি যেন বলিস নে !

ছেলেটি ইতস্তত করে। সে তার কাকীমাকে চেনে।সেখানে যেতে আর সাহসে কুলোয় না, তবু নারাণ মাস্টারের মনস্তুষ্টি করবার জন্যে পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে এগোয়। মনোরমা বসে ধান সিদ্ধ করচেন রান্নাঘরে। ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ডাকতে সাহস হয় না। মনোরমা হঠাৎ এগিয়ে বলেন,—কে ?বিষ্টু? কি রে ?

—এই—এই

—কি ?

—মাস্টার মশায় বলে দিলেন, এই—মোরে দুটি মুড়িদিতি !

—তা আর বলে দেবেন না কেন ?তাঁর কি ?কোথা থেকে কী জোটে তাঁর সেদিকে কতটুকু খেয়াল থাকে ?যা মুড়িনেই। বল্ গে যা—

নারাণ মাস্টার খেতে বসেচেন। বাড়ির পাশের একগরিব গেরস্ত বাড়ির ছোটো ছেলে ওৎ পেতে থাকে, কখন তিনি খেতে বসবেন। যদি না আসে, নারাণ মাস্টার ডাকেন—,

—আয় বিলু, আয়—

বিলু বলে—কি ?হ্যাঁ ?

সে ওই দুটো কথা বলতে শিখেছে।

হেঁটে স্কুল যেতে হয় অনেকদূর। দেরি হয়ে যায়, পথে যেতে যেতে শোনেন স্কুলের ঘণ্টা বাজচে। সাত মিনিট লেট্। হেডমাস্টার নীরদ রায় বড় কড়া লোক, বয়স পঞ্চাশের ওপর, চোখে চশমা, লম্বা দোহারা চেহারা।

—এত দেরি হলে রোজ রোজ চলবে না, নারাণবাবু— নারাণবাবু অপ্রতিভ মুখে হাজিরা খাতাখানা টেনে নেন। কিন্তু আরো পাঁচ মিনিট পরে হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু এসে একগাল হেসে বলেন,—উঃ, কি রোদ আজকেস্যার। গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

হেড মাস্টার বলেন, আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিক হল হুগলীতেই ?বসুন, বসুন—

—দুটো পান নিন স্যার।

একটি ছেলে ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নাম ইন্দুভূষণ। সুন্দর চেহারা। নারাণবাবুকে এগিয়ে এসে ক্লাসে নিয়ে যায়। ক্লাসে ছেলেদের ভিড়। নারাণবাবুকে সবাই ভালোবাসে।পছন্দ করে, ভয়ও করে। ক্লাস চুপ হয়ে যায়—একবার মৃদুভৎর্সনায়। অঙ্ক কষান বোর্ডে খড়ি দিয়ে।

ইন্দুভূষণ বলে—অঙ্ক কষার পরে সেই গল্পটা বলুন স্যার।

সব ছেলে সায় দেয়। নারাণবাবু বলেন—জানালা গুলোখুলে দাও, দেখো তো কেমন সুন্দর। মাঠ, গাছপালা ভগবানের তৈরি সুন্দর পৃথিবীকে চোখ ভরে দেখতে শেখো। শুধু বইয়েরপড়া পড়লে মানুষ হবে ?চোখের দৃষ্টি ফুটুক।

ইন্দুভূষণ বলে—ঐ দেখুন বাঁশঝাড়ের আকাশটা কেমন ময়ূরকণ্ঠী রং। নদীর ওপারে কি রকম কাশফুল ফুটেচে !

নারাণবাবুর মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই একটি ছেলেকে তিনি অন্তত দৃষ্টিদান করতে পারবেন হয়তো। ইন্দুভূষণ স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছে, এমন সময়ে হেডমাস্টার দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নজরে এক চমক ক্লাসরুমের দিকে চাইলেন। ইন্দুভূষণের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নারাণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন।

পাশে অন্য একটি ক্লাস। হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন।

মনোরমা স্বামীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করে।ও বেলা সত্যিই কিছু ছিল না খেতে দেবার। ভর্ৎসনার সুরেকথা বলেচেন। দুপুরে সেই দুঃখ মনে বড় বেজেচে। একটু চা দিতেও পারেন নি।

নারাণ মাস্টার বলেন,—অত হাসি-হাসি মুখ কেন ?কিখেতে দিচ্ছ ?

মনোরমা বলেন, হাত পা ধুয়ে নাও, এসো। স্বামীকেজল এগিয়ে দেন। পাখার বাতাস করেন।

নারাণবাবু জিগ্যেস করেন—ননী আজ ইস্কুলে যায় নিকেন ?

মনোরমা মিথ্যে করে বলেন—পেটের অসুখ হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ননীমাধব অত্যন্ত অবাধ্য প্রকৃতির ছেলে, এ বয়সে অনেক রকম ছল-চাতুরি শিখেচে। ভাদ্র মাসে বিলে জল বেড়েচে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়েচে, পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে।

স্বামীর জলখাবার ও চা দেন মনোরমা। তালের বড়া আর চা। গরম গরম বড়া ভাজেন, আর ভালো ভালো দেখে স্বামীর পাতে তুলে দেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ডাকে—বাড়ি আছেন স্যার ?

নারাণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

মনোরমা বলেন—বোসো বোসো। অত খাটলে শরীর থাকবে কেন ?একটু বোসো। আর দু-খানা ভেজে দিই।

সেই ছোট ছেলেটি টলতে টলতে এসে নারাণবাবুর পাশে বসে যায়। ওর মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান।

নদীতীরে প্রতিদিন একটু করে বেড়াবার অভ্যেস আছে নারাণ মাস্টারের। ইন্দুভূষণ ও আরো দুটি ছেলেকে নিয়ে নক্ষত্র সংস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন আজ।

ইন্দুভূষণ বলেচে—ভেনাস কোন্‌টা স্যার ?

নারাণ মাস্টার বলেচেন—ওই বাঁশঝাড়ের মাথার ওপরে—ঐ দ্যাখো।

—বেশ বড় নক্ষত্র—

—ওটিকে নক্ষত্র বলে না। ওটি গ্রহ। সৌর জগতের একটা গ্রহ। অন্য অন্য গ্রহগুলির নাম করো তো ?তোরা দেখেচিস্ শুক্র গ্রহ ?

—ঐ বাঁশঝাড়ের মাথায়?

হঠাৎ সেদিকে দেখা গেল ননীমাধব জলের ধারে ছিপনিয়ে মাছ ধরচে। বাপকে দেখে ননীমাধব ততক্ষণ ছিপ গুটিয়ে ফেলে। নারাণ মাস্টার দুঃখিত হন। বলেন—তুই তো আজইস্কুলেও যাস নি—অথচ তোর দিদির বাড়ি গিয়েচিস্ শুনলাম বাড়িতে !

ননী চুপ করে রইল। নারাণ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়েচে পাশের গ্রামেই।

-তোর মার কাছে বলে এসেছিস্ দিদির বাড়ি যাচ্চি ?

—হ্যাঁ।

–কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলি ? অমন করে আর কখনো বলবে না। মিথ্যে কথা কারো কাছে কখনো বলবে না। সত্য কথা বলবে, এতে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাও ভালো। সর্বদা মনে রাখবে এটি। কেমন তো ?আচ্ছা বাড়ি যাও।

বাড়িতে মনোরমা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করলেন। পাশের বাড়ির গাঙ্গুলি-বৌও শুভদা ঠাকরুনের কাছে সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলেন। শুভদা এসেচেন তেল ধার নিতে। গরিব বিধবা। মনোরমা যেটুকু তেল আছে, তার বেশি অংশটা শুভদাকে ঢেলে দিলেন। স্বামীর কথা বলেন ওঁদের কাছে।

—এমন লোক যদি দেখে থাকি কখনো পিসি। সংসারের দিকে নজর নেই; কোনো দিকে নজর নেই। কী নিয়ে যেলোকটা থাকে দিনরাত ! মেয়েটার ওই কষ্ট, তখুনি বলেছিলাম দোরের কাছে কুটুম্ব করতে নেই। দু-বেলা কথা শুনতে হবে, তখন তা শুনলেন না। এখন তাই হচ্ছে, যা বলেছিলাম।

শুভদা ঠাকরুন বললেন—শাশুড়ি খারাপ না হয় বুঝলাম।কিন্তু জামাই তো শুনেচি বড় ভালো ছেলে।

—ভালো হলে কি হবে পিসি, মায়ের কাছে জুজু। মার সামনে কথা বলতে পারে ছেলে ?উনি বলেন, মায়ের বাধ্যহয়ে থাকাই ছেলের উচিত। বললাম যে, কোনোদিকে নজরনেই ওঁর—চাল নেই, তেল নেই, আজ বাদে কাল সকালে কীহবে ঠিক নেই—কে শুনচে সে সব কথা ?ছাত্রদের নিয়েই ব্যস্ত। কেউ এক পয়সা দেবে না, ভূতের ব্যাগার খেটেই খুশি। আচ্ছা, বলো তো পিসি, এ কি রকম কাণ্ড ?

নারাণ মাস্টার বাইরে থেকে হাঁক দেন এই সময়ে—একটাআলো ধরো। বাইরের দিকে বড় অন্ধকার।

মনোরমা মুখঝামটা দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, সাতটা লণ্ঠনেআলো জ্বেলে তোমার জন্যে বসে আছি যে ! পিপে পিপে তেলের ব্যবস্থা করে রেখেচ যে ! এলে কোত্থেকে আমার মাথাকিনে, জিগ্যেস করি ?

নারাণ মাস্টার লজ্জিত মুখে ঘরে ঢকুতে ঢুকতে হোঁচটখান। মনোরমা বলেন—লাগলো নাকি ?তোমার দেহটা এমনিকরেই সাত খোয়ারে যাবে। দেখি কোথায় লাগলো ?..

মনোরমা রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরি করচেন। ননীমাধব খিড়কি দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে বললে—মা, বাবা কোথায়? ...বাটিতে কি ?

—ওঁর জন্যে দুটো চিঁড়েভাজা করেচি ঘি দিয়ে। না খেয়েখেটে খেটে ওঁর শরীরটা যে গেল ! এই খানিকটা আগে এমন হোঁচট খেলেন যে পা ভেঙে যেতে যেতে রয়ে গেল। ও থেকে তোমাকে না। তোমার জন্যে চালভাজা আছে—তেল মেখেদিচ্ছি। দিদির বাড়ি যাস নি ?

—হুঁ।

—কেমন আছে সে ?এতক্ষণ সেখানে ছিলি ?কি খেতে

দিলে ?

—কিছুই না। ঘণ্টাকর্ণ। দাও চিঁড়েভাজা—দিদি ভালোআছে।

—না—না। এ ওঁর জন্যে ঘি দিয়ে ভাজা। তোকে এরপরে দেবো এখন। বোসো গে যাও !

নারাণ মাস্টার চিঁড়েভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পকরেন।

মনোরমা বলেন—ননী এই এল অমলার শ্বশুরবাড়ি থেকে। অনেকক্ষণ ছিল সেখানে। অমলা ভালো আছে।

নারাণ মাস্টার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কে বললে এ সব কথা ?

—কেননী বললে, আবার কে বলবে ?সে এই তো এলওর দিদির বাড়ি থেকে। রান্নাঘরে বসে খাবার খাচ্ছে।

নারাণ মাস্টার একবার ভাবলেন স্ত্রীকে ছেলের গুণেরকথা সব খুলে বলেন। তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও সে আবার তার মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেচে। কিন্তু সরলা পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে নারাণ মাস্টার সে কথা চেপে গেলেন।

বাইরে থেকে ছেলেরা ডাক দিলে—বাড়ি আছেন স্যার ?

ছেলেরা পড়তে এসেচে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নারাণমাস্টার।

নারাণ মাস্টার স্কুলে গেলেন। হেড মাস্টার আজ আরকিছু বলেন না। ক্লাসে ক্লাসে ছেলেরা তাঁকে নিজের ক্লাসে পাবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। ইন্দুভূষণের ক্লাসে নারাণমাস্টার ঢোকেন। একটু পরে হেডমাস্টার এসে গম্ভীরভাবে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে গেলেন, এ ক্লাসটা তাঁর নয়। রুটিনটা দেখে ঢুকলেই তো হয়।

অঙ্ক কষাতে কষাতে কি করে এসে পড়ে সূর্যের কথা।সূর্য আছে বলে জগতে রঙের খেলা অদ্ভুত—নারাণ মাস্টারবোঝান। তা থেকে নিউটনের কথা এসে পড়লো—জ্ঞানতপস্বী নিউটন।

বাইরে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টার শোনেন। নারাণ মাস্টারের জনপ্রিয়তা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল।

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে ক্লাসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক।কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানাতে দাম্ভিকতা মাখানো।লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েচেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব একটু বেশিকরেই খাটান।

বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে পরীক্ষা করেন। প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর ক্লাস। ক্ষেত্রবাবু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান। বলেন, পড়িয়ে যান-আমি শুনি। বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন ক্ষেত্রবাবু।

সুরমশায় বলেন, ও সব কি আর কবিতা ?কবিতা ছিলসেকালে যদু মুখুয্যের। কুব্জপৃষ্ঠ নুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি, কিআশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি, ইত্যাদি।

কৌটো খুলে পান খান ক্লাসের মধ্যেই।

তারপরে যদুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যদুবাবু, মন দিয়ে শিবাজীর জীবনী বর্ণনা করচেন ছেলেদের কাছে।

মাখন সুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—বলো দিকি, দাশু রায় পাঁচালি লিখেছিলেন কত সালে ? মাস্টার বলে দাও না ওদের। দাশু রায়—আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না—

তারপর নারাণবাবুর ক্লাস। নারাণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েচেন অধ্যাপনায়; কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করচেন ক্লাসে। মাখন সুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি না অঙ্কের মাস্টার ? আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলেদের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারাণবাবু বললেন,—কথাটা উঠলো কিনা, আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী বিশেষত কবিতার। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের—

তা শেখাবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্যে আছেন, তাই করুন। আমি অনেকদিন থেকে শুনে আসচি, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলাম।

একটু পরে চাকর এসে একটা স্লিপ দিয়ে গেল। নারাণবাবুর তলব হয়েচে হেডমাস্টারের ঘরে।

নারাণবাবু পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দেখেন হেডমাস্টার অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখে বসে। বললেন—আপনি কোনোকাজ করেন না ক্লাসে—ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেন্ড ক্লাসে অ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর ! মোটে সিম্পল ইকোয়েশন ধরাচ্ছেন ?তা হলে কবেকোর্স শেষ করবেন আপনি ?আপনাকে নিয়ে বড় মুশকিল হলদেখচি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্পকরা।

নারাণবাবু বললেন—আমি বাজে গল্প করি নে— ছেলেদের উদার দৃষ্টি যাতে খোলে তার চেষ্টা করি।

—টেক্সট বইয়ের বাইরে যে একটা জগৎ আছে—তারসঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনাকে রাখা হয় নি এখানে। Know this school to be a machine for turning out matriculates—আপনাকে আর কত শেখাবো বলুন—

যদুবাবু ক্ষেত্রবাবু ও রাখালবাবু, নারাণবাবুকে জিজ্ঞেস করেন শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে—ব্যাপারটা কি হয়েছিল নারাণবাবু ?

সব শুনে যদুবাবু খুব লাফঝাঁপ দেন।

—আমি হলে অমন হেডমাস্টারকে দেখিয়ে দিতাম। দু-কথা দিতাম শুনিয়ে আচ্ছা করে। সিলেবাস শেখাতেএসেচে ?সিলেবাস ?অন্ত্যজ কোথাকার ! মুখের মতো জবাবদিয়ে দিতাম আজ—

ক্ষেত্রবাবু বলেন—একটু আস্তে—আস্তে

—কিসের আস্তে, ভয় করি নাকি ?এ শর্মা কাউকে থোড়াই কেয়ার করে তা বলে দিচ্ছি।

স্কুলের চাপরাশি এসে ডাকলে—হেডমাস্টারবাবু যদুবাবুকে ডেকেচেন—

যদুবাবু হঠাৎ বাতাস-বের হওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেলেন। হেডমাস্টারের ঘরে জড়িত পদে ঢুকে বললেন, আমাকে ডাকচেন ?

—হ্যাঁ, আপনি শনিবার ফোর্থ ক্লাসের উইকলি পরীক্ষারনম্বর এখনো কেন দেন নি ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, যদুবাবু ! আজ নদিন হয়ে গেল—কাজে আপনার বড় গাফিলতি হচ্ছে। গতবারও এমনি করেছিলেন আপনি। এ রকম আর কখনো করবেন না আশা করি। ওতে ছেলেদের আসুবিধে হয়, বুঝলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিলবলেই, নইলে এতদিন—

—আচ্ছা, এখন আসুন তবে।

শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে ফিরে আসতেই অন্য সব মাস্টার সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—কর্তা কি জন্যে ডেকেছিলেন হে ?

যদুবাবু হাত-পা নেড়ে বলেন—দিয়ে এলুম শুনিয়েদু-কথা। আমায় বলে কিনা ফোর্থ ক্লাসের খাতা ফেরত দিতেএত দেরি হল কেন ?আমি মুখের ওপরে বলে এলাম মশাই, চল্লিশ টাকা মাইনেতে তো চলে না, আমাদের টুইশানি করেখেতে হয়। সময় পাই কখন যে খাতা সকাল সকাল দেখে দেবো। দিলাম শুনিয়ে।

—বললেন ওই কথা ?

—বলবো না ?এ শর্মা থোড়াই কেয়ার করে। হি মাস্ট বিটোল্ড সাম হোম ট্রুথ—

পাশের বাড়িতে রেডিওতে গান হয়। ও যেন একটি অন্যজগৎ, রসের জগৎ। যে জগতের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনোপরিচয় নেই। শিক্ষকেরা কান পেতে শোনেন।

বেরিয়ে এসে সবাই একটা চায়ের দোকানে বসেন।ভাঙা পেয়ালায় চা খান। নারাণবাবুর অপমানে সবাই দুঃখিত।রাখালবাবু বলেন—যেদিন এদেশে শিক্ষকতার কাজ সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে, সেদিন বুঝতে হবে জাতি হিসেবে আমরা জেগেছি। আমাদের স্থান কোথায়, নারাণবাবুর ওপর মাখনবাবুর ব্যবহারেই বুঝে নেওয়া উচিত।

রাখালবাবু নারাণবাবুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। বড়শ্রদ্ধা করেন তিনি তাঁর এই সরল অকপট উদার-দৃষ্টিসম্পন্নসহ কর্মীটিকে। রাখালবাবু বিদেশী শিক্ষক, এখানে তাঁর বাসা। বাসাতে তাঁর স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে ও ভাইঝি নিভা থাকে।নিভার বয়স বছর আট নয়, ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটি। নারাণবাবু তাকে কাছে ডেকে আদর করেন।

নারাণবাবুর মেয়ে অমলার শ্বশুরবাড়ি। অমলার শাশুড়ি তার ওপর অত্যন্ত কু-ব্যবহার করে। ছেলে সুকুমারের সঙ্গে অমলার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। অমলা সেজেগুজে জানলায় বসে আছে—আজ স্বামী কলকাতা থেকে আসবে অনেকদিন পরে।

শাশুড়ি এসে বলেন—বলি হ্যাঁগা, বৌমা, বিকেলে ঝাঁটনেই, পাট নেই—দোরে জল দেওয়া নেই—অমন পটেরবিবি সেজে জানলায় বসে রয়েছ কেন ?সে-গুড়ে বালি ! সুকুআজ আসবে না চিঠি লিখেচে। তুমি উঠে গিয়ে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এসো আর এ বেলার ভাত চড়িয়ে দাও গে।

অমলা সলজ্জ মুখে উঠে গেল রান্নাঘরে। তার মন ভেঙেগিয়েছে। স্বামী সে কথা তো গতবার বলে যান নি। শাশুড়িমিথ্যে কথা বলেছিলেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে সুকুমার এল। অমলার জন্যে শাড়ি নিয়ে—নিজে আহ্লাদ করে দেখাতে গেল। মা কাপড়খানা ছিনিয়ে নেন ছেলের হাত থেকে। বলেন—এ আমার পাঁচীর সাধের সময় তাকে দেবো। বৌয়ের জন্যে আর রোজ রোজকাপড় আনতে হবে না। যে গুণধর বৌ ! সংসারের কুটোটুকুদু-খানা করে উপকার নেই। সারা বিকেল সেজেগুজে ঠায় বসে রইল জানলায়। বলে, কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন হেজল-দাগড়া তেমনি বদমাইশ। হবে না ?ছোট ঘরেরমেয়ে যে ! ওর বাবার নাম পাগলা মাস্টার।

অমলা আড়াল থেকে স্বামীকে দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবার প্রতি অমন অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগে সে আর স্থির থাকতে পারে না।

সামনে এসে বলে—বাবার নামে অমন যা তা বলবেন না আপনি। আমি কি করেচি না করেচি আপনাদের তা জানি নে, কিন্তু আমার বাবা কারো কোনো অনিষ্ট করেন নি বা করতে পারেন না এটা আমি ভালো করেই জানি।

শাশুড়ি ঠাকরুন রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করলেন। ছেলেকে দিব্যি দিলেন সে যেন ও বৌয়ের মুখদর্শন না করে।

অনেক রাত্রি জেগে দু-জন দু-জানলায় বসে রইল।

সেদিন নারাণবাবু আহার করতে এসে বললেন—এঁচোড় কোথা থেকে পেলে ? অসময়ে এঁচোড়।

মনোরমা বললেন—আমি জানি নে। ননীমাধব কোথা থেকে এনেচে।

নারাণ মাস্টার বললেন—কোথা থেকে আনবে ?এ নিশ্চয় অন্য কারো গাছ থেকে চুরি করে এনেছে। আমাদের নিজেদের গাছ নেই—কেই বা দেবে অসময়ে?বলি শোনো, চুরির জিনিস আমার পেটে সইবে না। আমার সংসারের কেউখাবে না। ফেলে দাও সবটুকু।

মনোরমা অনেক যত্ন করে দরিদ্র সংসারে অসময়ের এঁচোড় রেঁধেছিলেন। স্বামী খেতে ভালোবাসেন বলে তাঁর অতআগ্রহ। এই আগ্রহের জিনিসটা নির্মমভাবে ফেলে দিতে তাঁর চোখে জল এল। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না মুখে। তিনিতাঁর স্বামীকে ভালো ভাবে চেনেন। অনুনয়ে-বিনয়ে এক্ষেত্রে কোনো ফল হবে না। অভিমান করে চুপ করে রইলেন।

মনোরমাকে বুঝিয়ে বললেন নারাণ মাস্টার—দেখো, ছেলেকে শুধু উপদেশ দিলে কাজ হবেনা।"আপনি আচরি ধর্মপরেরে শিখায়"—আমরা পিতামাতা, এই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া দরকার। মুখে বলি, অথচ চুরির এঁচোড় রেঁধেখাই—এতে ছেলেপিলে ভালো উপদেশ কখনো নেবে না।আমি জানি তোমার মনে কষ্ট হয়েচে, কিন্তু আমি যে পিতা, তুমি যে মা—আমরা যে শিক্ষক।

নারাণ মাস্টারের ক্লাসে জানালা বন্ধ ছিল। তিনি ক্লাসে গিয়েই জানালা খুলে দিতে বললেন।

ছেলেদের বলেন—মনের জানলাও সব সময় ঐ রকম খুলে রাখতে হবে। দ্যাখো তো কেমন নীল আকাশ ?চোখকে তৈরি করো বাইরের সৌন্দর্য দেখতে। জীবনে মস্ত আনন্দ পাবে।

হেডমাস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। একটু পরেডেকে পাঠালেন।

—কেন ডেকেচেন স্যার ?

—এদিকে আসুন, বসুন দয়া করে।

নারাণ মাস্টার বসেন। হেডমাস্টার বলেন—আপনাকে কথাটা বলি। আপনার অঙ্কের ফল অত্যন্ত খারাপ এবার। কাল পরীক্ষার নম্বর আনিয়েচি ইউনিভারসিটি থেকে। ছ-টাফেল অঙ্কে। আপনি এদিকে দেখি ক্লাসে বসে আর্টের চর্চা করেন। সেজন্য কি আপনাকে রাখা হয়েচে স্কুলে ? কতবার না আপনাকে একথা আমি বলেচি ?বড় দুঃখের বিষয় নারাণবাবু।

নারাণবাবু চুপ করে থাকেন। সাহস করে কিছু কথাবলতে পারলেন না।

রাখালবাবু টীচার্স রুমে বসে সব কথা শুনে বলেন—ও, আর ওঁর সাবজেক্টে যে এগারটা ফেল ! তার বুঝি কোনো কৈফিয়ত নেই ?গরিবের ওপর যত জুলুম। বেশ!

বাজারে এসে সেই দোকানে মাস্টারেরা ভাঙা পেয়ালায়চা খান। সেখানে রাখালবাবু কথাটা তোলেন। স্কুল কমিটির অবিচার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। একজন মাস্টার (যদুবাবু)বলেন, শুধু টিউশনি করি সকাল থেকে পাঁচটা। বিকেলে আরো পাঁচটা। তাতেও কি সংসার সুচারুরূপে চলে ?একটি বড় মেয়ে ঘাড়ে। দেশের তরুণদের যাঁরা গড়ে তুলবেন, গোটা জাতিটিকেই তাঁরা গড়ে তুলচেন—তাঁদের দিকে কে তাকায় ?

ভগ্নমনে যে যাঁর বাড়ি যান। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যদুবাবু বলেন—তোমরা যাও, আমি আবার গুণীমল্লিকের বাড়ি প্রাইভেট পড়াতে যাবো।

—খেলেন না কিছু ? বাড়ি যাবেন না ?

বাড়ি গেলে সময় পাবো কখন ?ওই কোনোদিন রাস্তায় খেতে খেতেই পথ চলি—দু-এক পয়সার বিস্কুট কিমুড়ি। কোনোদিন তারও সময় হয় না। আমাদের আবার খাওয়া, তুমিও যেমন ভায়া !

স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে সভা। সভায় নারাণমাস্টারের ছাত্র ইন্দুভূষণ চমৎকার আবৃত্তি করলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—এমন আবৃত্তি শিখিয়েচে কে ?

—নারাণ মাস্টার মশাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম মি. কান্ওয়ার। পাঞ্জাবী। কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট। নারাণ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতেবলতে ওঁর বাড়ি আসেন। পথে মাখন সুর কি একটা কথা বলতে গেলেন খোশামুদের ভাবে হাত জোড় করে—স্যার, আমাদের অয়েল মিলের লাইসেন্সটার বিষয় একবার—

মি. কান্ওয়ার বিরক্তির সুরে বললেন—আভি নেই—নট নাউ-কাম অ্যান্ড সি মি ইন্ মাই অফিস্—

মি. কাওয়ারকে নারাণ মাস্টার পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্যবোঝান। জ্যোৎস্না রাত্রি। মি. কান্ওয়ার বলেন—মি. গাঙ্গুলি, আপনি একজন আইডিয়াল টীচার—আপনি আমাকেও Rural Bengal-এর রূপটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন—আমি আপনাকে মনে রাখবো—

মনোরমা ভাঙা পেয়ালায় দু-জনকে চা দেন।

মাখন সুরের বাড়িতে ক্রিয়াকাণ্ড। সব মাস্টার ভূতের মতো খাটচেন। কেউ অভ্যর্থনা করছেন, কেউ রান্নার তদারক করচেন।

নারাণ মাস্টারকে মাখনবাবু বলেচেন চা দেওয়া পরিদর্শন করতে। সার্কেল অফিসার মি. সুধীন বসুকে চা নিজের হাতে দিতে বলেন। নারাণবাবু চা দিতে গেলে তরুণ মি. বসু উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বলেন—স্যার আপনি কেন ?রাখুন রাখুন—

আমায় চিনতে পারলেন ? আমি সুধীন। আপনার ছাত্র।

নারাণ মাস্টার বলেন—কোন্ বছর পাস করেছিলে বাপু, এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও। মনে তো হচ্ছে না।

—মানিকদের ব্যাচ, উনিশশো ত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পাসকরি স্যার। আপনি আমার গুরু।

—বেশ, বেশ। বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল তুমি কি আমাদের সার্কেল অফিসার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

—আমাদের বাগদিপাড়ায় একটা টিউবওয়েল করে দিতেপারো বাবা ? খালের নোংরা জল খেয়ে সব কলেরায় মরচে। আমার দুটি ছাত্র মারা গিয়েচে। ওরা গবির, তোমাদের সামনে অভাব-অভিযোগ জানাতে পারে না। এই কাজটি তোমার গুরুদক্ষিণা হবে বাবা, যখন গুরু বলে ডাকলে তখন বলি।

ছেলেটি খাতা বের করে বললে—গ্রামের নাম আর পাড়াটা বলুন স্যার, টুকে নিই। আজকাল ভালো কাজ করবো বললেও করা যায় না, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে কি বোঝাব ! বিদেশী শাসন চলেচে শোষণের জন্যে, প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়। গভর্নমেন্টের কাজে ঢুকে সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি—আচ্ছা স্যার প্রণাম। পায়ের ধুলো দিন আর একবার।

ছেলেটি বিদায় নিতে উদ্যত হলেমাখনসুর হাত কচলাতে কচলাতে তার পেছনে পেছন খানিক দূর গেলেন।

আরো খানিকক্ষণ খেটে বেলা গেলে নারাণ মাস্টার অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি চলে গেলেন। কেউ জিগ্যেস করলে না তিনি খেয়েচেন কিনা।

মাখন সুর যাবার আগে কেবল বললেন—নারাণবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন, ভালো চণ্ডীর গানের আসর হবে কিনা। থানার বড় দারোগাবাবু আসবেন খবর দিয়েচেন।

ছ বছর পরে।

রাখালবাবুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রীর কলেরা। নারাণ মাস্টার ছাত্রদল নিয়ে সেবা করচেন। ছেলেদের মধ্যে ইন্দুভূষণই পরিচালক। সবাই ব্যস্ত, কেউ জল গরম করচে, কেউ ডাক্তারবাবুর হাতে সাবান দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে। রাখাল মাস্টারের মেয়ে প্রীতি ইন্দুভূষণকে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতায় প্রীতির তরুণ হৃদয় কানায় কানায় ভরা। রাখালবাবুর স্ত্রী রাত্রেমারা গেলেন। প্রীতিকে ইন্দু বোঝায়। এর আগেও ইন্দুর সঙ্গে প্রীতির দেখা হয়েচে দু-একবার। নারাণ মাস্টার রাখালবাবুর বাসায় খবরের কাগজ আনতে পাঠাতেন, প্রীতিই কাগজখানা ইন্দুভূষণের হাতে দিত।

কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হল ক্রমশ। মাতৃবিয়োগের পরশোকাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ইন্দুভূষণ সান্ত্বনা দিত ওকে। রাখালমাস্টার বাড়ি থাকতেন না। দু-জনে প্রেম গড়ে উঠলো।ইন্দুভূষণ ম্যাট্রিক পাস করে তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তুনারাণবাবুর বাড়িতে সে নিয়মিত আসে।

মনোরমা বয়স ও দারিদ্র্যের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচেন।ছেলে অবাধ্য, লেখাপড়া করলে না, দু-বার ম্যাট্রিক ফেল করেচে। মাকে এসে বলেচে, মা একটা কলের গান কিনবো, টাকা দাও

মা বললেন—কি করে বলিস এসব কথা ননী ?ওঁর বয়স হয়েছে, সংসারের জন্যে ওঁর এখন চিন্তা এসে পড়েচে, আগে তো গায়ে আঁচড় লাগতে দিতাম না। এখন ভালো করে একবাটি দুধ খেতে দিতে পারি নে ! তোকে কলের গান কেনবার টাকা কোথা থেকে দেব ?

ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করে—সমানে উত্তর করে। অবশেষে বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

নারাণ মাস্টার ঢুকে স্ত্রীকে চোখ মুছতে দেখে বলেন—কিহল, চোখে কি ?

তিনি তো সংসারের কিছু খবর রাখেন না। স্ত্রী বলেন— চোখে কি হয়েচে, সব সময় জল পড়চে।

ওঁর মেয়ে আবার চিঠি দিয়েচে। মনোরমা বলেন সেকথা স্বামীকে—ওকে একবার দেখে এসো না গো ! ওদিকে তো যাও !

নারাণ মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। পাশেরগ্রামে যাবার সময় ওর শ্বশুরবাড়ির সামনে দিয়ে যান। মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা।

জামাই বলে, আসুন বাড়িতে।

নারাণবাবু বলেন—সময় নেই, যাবো না, অমলাকেও বুঝিও।

বাড়ি এলে মনোরমা বলেন,—হ্যাঁগা, তুমি গিয়েছিলে ?

নারাণবাবু বলেন—হ্যাঁ, খুব যত্ন করলে। অমলার শাশুড়িনিজে এসে কত কথা বললে। জল খাওয়ালে।

প্রীতি ও ইন্দুভূষণের শেষ দেখা। প্রীতির বিয়ে অন্যস্থানে স্থির হয়েচে। প্রীতির অভিভাবকদের হাত এতে সম্পূর্ণ; বেচারি প্রীতি নিরুপায়া, সে শুধু জানাতে এসেচে গোপনে ইন্দুভূষণকে। বাড়ির পিছনে এক জামতলায় দু'জনে এসে দাঁড়িয়েচে। প্রীতি বললে—আমি কি করবো ইন্দুদা, আমি কি করতে পারি ? আমি তোমার সঙ্গে পালাতে পারি, কিন্তু বাবা তাতে মরে যাবেন। তা করতে পারবো না।

প্রীতির বিবাহের পরদিনই সকালে উঠে মনোরমা দেখলেন ছেলে ননীমাধব ঘরের দোর খুলে রেখে মায়ের বাক্স ভেঙে তিনশো টাকা ও বাবার সাবেক আমলের ঘড়িটি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। একখানা চিঠি খুঁজে পাওয়া গেল, তাতে সে লিখেছে, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে আজ সে বাড়িছেড়ে চললো, বাবা-মা যেন কিছু মনে না করেন।

নারাণ মাস্টার স্ত্রীকে বোঝান।

মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, তুমি যাও, ওকে এনে দাও।

—যাবো, ভেবো না।

—হ্যাঁগা, সে কোথায় গেল ?

—ভেবো না।

—তাকে এনে দেবে ?

—হ্যাঁ, এনে দেবো।

এমন একদিনে নারাণবাবুর চাকরি গেল। এর মস্ত কারণ, একজন দেশসেবকের মৃত্যুতে নারাণবাবু ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সভা করেছিলেন।

ছেলেদের বিদায় অভিনন্দন হল গাছতলাতেই। নারাণবাবুগ্রহণ করলেন। হেডমাস্টার ও মাখন সুর স্কুলগৃহে উক্ত অভিনন্দনের অনুষ্ঠান করতে দিতে রাজিহলেন না। বিদায়ের সময় নারাণবাবুর মর্মস্পর্শী বাণীতে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

নারাণবাবু অভিনন্দন-পত্র হাতে হেঁটে আসচেন, মাখন সুর পাশ দিয়ে ফিটন গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভা। মাখন সুর এলে সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো—অথচ নারাণবাবু যে বেঞ্চিতে বসে, সেই বেঞ্চিতে বসে সাধারণ লোকে বিড়ি খাচ্চে। পেছনের বেঞ্চিতে বসে আছেন নারাণবাবু, জায়গা না পেয়ে। মাখন সুরের বক্তৃতা শুনচেন।

মাখন সুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হবেন, জনসাধারণের ভোট চান। বক্তৃতায় তিনি বলচেন, তিনি আজ অনেকদিন ধরেদেশের সেবক ও ভৃত্য তা সকলেই জানেন। স্কুল ও সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে তিনি কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করেচেন, তা যে সার্থক হয়েচে—এতেই তিনি ধন্য। অন্য কোনো প্রতিদান তিনি চান না, কেবল দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ছাড়া...ইত্যাদি। খুব চটাচট হাততালি পড়চে।

বাইরে এসে নারাণবাবু বিড়ি টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলেন। লোকের কাছে বলেন—চমৎকার লোক মাখনবাবু। কেমন চমৎকার বক্তৃতা দিলে। দেশের মধ্যে অমন লোক আর নেই। বড় ভদ্রলোক।

এক জায়গায় বসে ছেলের কথা ভাবেন। পরের ছেলেমানুষ করেছেন অথচ নিজের ছেলের কিছুই করতে পারলেন না চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠলো। ছেলেটা হয়তো পথে পথে ভিক্ষে করচে। হয়তো অনাহারে কষ্ট পাচ্চে। চোখের জল মুছলেন চাদরের খুঁটে।

মনোরমা বৈকালে অন্যমনস্কভাবে একলা বসে বাড়িতে।স্ত্রীর চেহারা দেখে নারাণবাবুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। পতিব্রতা স্ত্রী বাইরে কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত অন্তর পুড়ে উঠচে আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্যে।

পেছন থেকে নারাণবাবু স্ত্রীর শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মলিনমূর্তি দেখেন।

তাঁকে আসতে দেখে মনোরমা ধড়মড় করে উঠে বলেন—ওমা, কখন এলে তুমি ?আমি টের পাই নি !

—এই তো এলাম। লেবুর আচার করবে বলে লেবুর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

—সত্যি তাই নাকি ? পেলে ?

মনোরমা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলেন—দাঁড়াও, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, দুটো মুড়ি মেখে দিই।

নারাণ মাস্টার বলেন–বসো বসো। একটু গল্প করো। খেটে খেটেই গেলে।

মিনতিভরা সুরে মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, ননীর কোনো সন্ধান পেলে ?

ইন্দুভূষণ একটা ঘাটে একদিন বসে আছে, সেখানে বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রী সুরমার সঙ্গে তার আলাপ হয়।সুরমা ও তার দলবল পল্লিগ্রামের দৃশ্য তুলতে এসেছিল। ওর সাহায্য চাইলে। সেই সূত্রে সুরমার সঙ্গে আলাপ।

সুরমা ওকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে বললেবারবার—আসবেন তো ?ঠিক বলুন ?

বালিগঞ্জের একটা ঠিকানা দিলে।।

সেখানে ইন্দুভূষণ দেখা করতে গেলএবং প্রথম পদার্পণের দিনই সুরমার জালে আবদ্ধ হল। সুরমা সুন্দরী সুগায়িকা; ইন্দুভূষণ তরুণ ও সুদর্শন। দু-জনইদু-জনের প্রতি আকৃষ্ট হল।সুরমা বার বার আসতে বললে ওকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ি এসে ইন্দুভূষণ মনমরা, উদাস হয়ে রইল। সুরমারচিঠি এল—একবার অতি শীঘ্র যেতে বলেচে।

সে গেল আবার। সুরমা ওকে খুব আদর আপ্যায়ন করলে। নিজের হাতে তৈরি সন্দেশ খাওয়ায়। গান শোনায়। শেষে সুরমা বলে—অনেক রাত হয়েচে, কোথায় যাবেন আজ ? এখানেই থাকুন। কোনো অসুবিধে হবে না। দু-জনে সারারাত গল্প করি আসুন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে বড় ভালো লাগে।

ইন্দুভূষণ রইল না। সুরমা বার বার বলে দিলে—সামনের শনিবারে আমার জন্মদিন। নেমন্তন্ন রইলো আপনার। কথা দিন আসবেন ?

গেল ইন্দুভূষণ জন্মদিনের উৎসবে। গান, আহার-বিহার। আরো কয়েকটি অভিনেত্রী নিমন্ত্রিতা। তারা ওদের দুজনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানায়। সেদিন সুরমা ইন্দুভূষণকে বাড়ি যেতে দেয় না। ছাদে বসে দু-জনে গল্প করে।

সুরমা ও ইন্দুভূষণ মোটরে যায়, নারাণ মাস্টার পথ দিয়েযান। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলের সন্ধানে, মনোরমার মিনতিতে। সারাদিন নানাস্থানে ঘুরেচেন সন্ধান করে, কোথাও সন্ধান পান নি। সামান্য পয়সা হাতে, পেটভরে জলখাবারও খেতে পারেন নি। ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডের মোড়ে গাড়িখানা হঠাৎ বেগে সামনে এসে দাঁড়ালো। নারাণ মাস্টার থমকে দাঁড়ালেন। কাদাজল জমেছিল রাস্তার এক জায়গায়, ছিটকে তাঁর গায়ে লাগলো। নারাণবাবু চেয়ে দেখলেন ইন্দুভূষণ ও একটি সুবেশা তরুণী গাড়িতে বসে। পাশের একটি লোক বলে উঠলো—রগড় দেখলেন মশাই ? চিনেচেন তো ?

নারাণ মাস্টার পাড়াগাঁয়ের মানুষ। তিনি কি করেচিনবেন ?

—চিনলেন না ?সুরমা দেবী !

—সে কে ?

—কোথায় বাড়ি আপনার ?সু রমা দেবী বিখ্যাত চিত্রতারকা—নামও শোনেন নি ?এঃ ! আপনার কাপড়খানা একেবারে নষ্ট করে দিয়েচে যে !

নারাণবাবু চিনতে পারলেন। সরল মানুষ, জিনিসটাঠিক বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে গেলেন। একজন চিত্র-অভিনেত্রীর সঙ্গে ইন্দুভূষণ কি করচে ?ও কি কোনো ফিল্ম কোম্পানিতে কাজ নিল নাকি ?কিন্তু তাঁর ছাত্র, অমনযত্নে-গড়ে-তোলা ছাত্র শেষে একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে বেড়াবেএভাবে ?

ইন্দুভূষণ চিনতে পেরেছিল নারাণ মাস্টারকে। সে চমকেওঠে। তারপর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুরমা বললে—আচ্ছা, হাজরার মোড়ে সেই যেএক পাড়াগেঁয়ে বুড়োলোক আমাদের মোটরের সামনেপড়লো—ওমা, কী কাদাই লেগে গেল ওর গায়ে ! ভাবলেও হাসি পায়। ব্রেক কষেছিল সময়ে—তাই খুববাঁচা বেঁচে গিয়েচে, তারপর থেকেই তুমি অমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন ?আরভালো করে কথা কইচ নাচেনো নাকি ও বুড়োকে ?

ইন্দুভূষণ চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, তোমার আবার যত বাজে কথা। ইয়ে—আমি তোমার সঙ্গে এখন আর যাবো না সুরমা।

—কেন ?

—আমায় একটু নামিয়ে দাও। একটু কাজ আছে।

—কোথায় যাবে ?

—সে বলবো এখন। তুমি যাও আমি নামি।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলে ইন্দুভূষণ নারাণ মাস্টারকে।এদিক ওদিক। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে একটা পার্কে এসে ক্লান্ত হয়ে বসলো। নিজেকে কোথায় যেন অপরাধী বলে মনেহতে লাগল—নিজের কাছেই নিজেকে। না, সে সুরমার কাছে আর যাবে না। বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাবে আজই।

এইখানে একটু পরে প্রীতি ওকে দেখতে পেল সামনেরজানলা থেকে। সেটা প্রীতিদের বাসা। একটি ছোট ছেলে এসেওকে ডাকলে। ইন্দুভূষণ দ্বিধাজড়িত পদে অপরিচিত দ্বারদেশেগিয়ে দাঁড়াতেই দোর খুলে দাঁড়ালো প্রীতি হাসিমুখে।

—ইন্দু-দা !

—প্রীতি !

—এসো বাড়ির মধ্যে। কবে কলকাতায় এলে ? কি করছো আজকাল ?তুমি এসো বাড়ির মধ্যে।

বাড়িতে আর কে আছেন ?

—কেউ নেই। কেবল এক ননদ ও বুড়ি খুড়শাশুড়ি।উনিও আসবেন এখুনি। তুমি এসো ইন্দু-দা।

—আমি যাবো না প্রীতি। একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি। অন্য সময়ে এসে দেখা করবো।

—তা হবে না। এক পেয়ালা চা অন্তত খেয়ে যেতেইহবে।

এই প্রীতিকে ভুলতেই সে সুরমার ফাঁদে পা দিয়েছিল।সেই প্রীতি আজ তার সামনে। গ্রামের সম্বন্ধে অনেক কথা হল।তারপর ইন্দুভূষণ বিদায় নিলে।

নিয়েই সোজা সুরমার ওখানে গিয়ে উঠলো সে।

মনোরমা ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে শয্যাগ্রহণ করেচেন। নারাণ মাস্টার বাড়ি এলে তিনি উঠে স্বামীকে জলদেন হাত-পা ধোবার। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চা এনে চা করে খাওয়ান—কারণ ঘরে কিছু নেই। মূর্তিমান দারিদ্র্য সংসারের প্রতি রন্ধ্রে তার পাশ বিস্তার করেচে। চাকরি নেই নারাণবাবুর। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা আদায় হয় নি।

মনোরমা করুণ মিনতির সুরে বলেন—হাঁগো, ননীরকোনো সন্ধান পেলে ?নারাণবাবু কী জবাব দেবেন। কোনো সন্ধানই মেলে নি। সে কথা বলতেও কষ্ট হয়।

নারাণবাবু কাছে বসে স্ত্রীকে বোঝান।—ভগবানের নাম করো। সংসারে সব দুঃখ-কষ্টকে যে জয় করতে পারে, সে-ইতো যথার্থ মানুষ। সংসার পরীক্ষার স্থল। এই মনে করে চলবেযে আমাদের সত্যকার স্বাধীনতাকে কেউ হরণ করতে পারেনা।

হাতে পয়সা নেই। স্কুলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বাকি।স্কুলে যান নারাণবাবু। ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে বার হয়েএসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, উল্লাস প্রদর্শন করে।

হেডমাস্টার সদয় ব্যবহার করেন। চেয়ারে বসিয়ে বলেন—আপনি শুনলাম কলকাতায় গিয়েছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলেন ?

—না।

—শুনলাম আপনার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচেন। আহা, তা তো হতেই পারেন। I offer my sympathy Naran Babu কিন্তু কি করবেন বলুন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

হেডমাস্টারের কথায় মাখন সুরের সঙ্গে দেখা করেন।

মাখন সুর বৈঠকখানায় বসে আছেন মোসাহেব নিয়ে। নারাণবাবুকে তাঁরা বসতেও বলেন না। তিনি গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়িয়েই থাকেন।

মাখনবাবু বললেন—এই যে আসুন মাস্টার মশাই— ভালো আছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক রকম চলে যাচ্চে।

—তারপরে কি মনে করে ?

—আমার সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা—অনেক দিনহয়ে গেল, সংসারে এখন বড় অভাব। টাকাটা আমার দেওয়ারব্যবস্থা করুন দয়া করে।

নিশ্চয়ই, সে টাকা দিতে হবে বৈ কি। আপনার ওপরস্কুল-লাইব্রেরির ভার ছিল, তার অনেকগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলি আপনি মীমাংসা করে দিয়ে টাকা নিয়ে যান।

—সে কি কথা ?এতদিন তো হেডমাস্টার কিছু বলেননি ?আর আমার ওপর লাইব্রেরির চার্জও ছিল না। সে ছিল ক্ষেত্রবাবুর ওপর। আপনি হেডমাস্টারের সার্কুলার দেখবেন।

—আচ্ছা, এখন যান। আমি বড় ব্যস্ত।

—আমার হাত খালি। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ। ছেলেটিকেসন্ধান করতে গিয়ে খরচপত্র হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে।বড় উপকার হত এই সময় টাকাটা পেলে।।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমি তো বেনিয়মে বেহিসেবেটাকা দিতে পারি নে ! আমার এখন সময় নেই। এখন যানআপনি।

বাড়ি ফিরে এলেন নারাণ মাস্টার।

মনোরমার শরীর খারাপ। তার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসতে পারলেন না। এক দোকানে জোড়া সন্দেশ বিক্রি হচ্চে, চার আনা জোড়া, মনোরমা এসব খেতে পান না, গরিবের ঘরের স্ত্রী। বড় ইচ্ছে হল ওই জোড়া সন্দেশ একখানা নেবেন।কিন্তু পয়সায় না কুলোনোতে, শুধু হাতে চলে আসেন।

মনোরমা আগে আগে এসে আগ্রহপূর্ণ ভাবে বাজারের থলি খুলে দেখতেন—জিজ্ঞেস করতেন—কি আনলে দেখি ?

আজ তিনি নিরুৎসাহ, মনমরা উদাস। নারাণবাবু দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠেন।

বাইরে ছেলেরা এসেঠিক ডাকে প্রতিদিনের মতো। এখন আবার অন্য ছেলেদের নক্ষত্র বোঝান। ভাবেন ইন্দুভূষণের গাড়ির চাকায় সেদিন কাদা ছিটকে লাগার দৃশ্য, সঙ্গে অভিনেত্রী শ্রেণির একটি মেয়ে। দুঃখ হয় তার।

সুরমাকে নক্ষত্র চেনাচ্ছে ইন্দুভূষণ। ছাদের ওপর অন্ধকার। তারা-ভরা আকাশ।

সুরমা বললে—এই সব শিখে কি হবে ? তার চেয়ে চলো

—জানো আমার একমাস্টার মশাই ছিলেন। তিনি আমার ছেলেবেলায় আমায় এসব চিনিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের দৃষ্টি যত প্রসারতা লাভ করবে, ততই সে অমরত্বের সম্মুখীন হবে। মানুষ বড় কিসে ?এই বৃহতের সন্ধান—ভূমার সন্ধান সে পেয়েচে বলে—আমার গুরুর এই উপদেশ।

—তোমার গুরু কে ?কোথায় থাকেন ?

—তুমি তাঁকে দেখেচ।

—দেখেচি কোথায়?

—সে বলবো না।

—একদিন তাঁকে এখানে আনবে ?

—আসবেন না তিনি ! জীবনে বৃহতের সন্ধান তিনি আমায় দিয়েছিলেন, এতদিন তত বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজকাল যেন বেশি করে বুঝচি সুরমা।

সুরমার বিলাসিনী পল্লবগ্রাহী মন এ উক্তির গভীরত্ববুঝতে পারলে না।

সে বললে—চলো নিচে যাই—তোমাকে গান শোনাই।ঠান্ডা লাগচে। মাঝে মাঝে তোমার মুখ গম্ভীর দেখি কেন বলোতো ? তোমার কি অভাব এখানে ? কোনো অসুবিধার মধ্যে কিআমি রেখেচি তোমাকে ?চলো !

সুরমার গানের কথায় ইন্দুভূষণ জীবনের গভীর তত্ত্বআবার বিস্মৃত হল।

মনোরমা শয্যাগত। পুত্রের বিচ্ছেদ শোক-কাতরা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নারাণবাবু নিজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঠিক সেই সময় টেলিগ্রাম এল আলিপুরের জেলহাজত থেকে। তাঁরছেলে ননীমাধব চুরির চার্জে অভিযুক্ত হয়ে আলিপুরে আছে।

স্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নারাণমাস্টার চলেন আলিপুরের দিকে। মনে পড়লো তাঁর একটি পুরনো গান—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া

বাহির হনু তিমির রাতে

তরণীখানি বাহিয়া

অরুণ আজি উঠেছে

অশোক আজি ফুটেছে।

না যদি উঠে, না যদি ফুটে

তবুও আমি চলিব ছুটে

তোমার মুখে চাহিয়া !

আলিপুরের জেল হাজতে ছেলের সঙ্গে দেখা হল।

ওখানে গিয়ে শুনলেন তার ছ-মাস জেলের আদেশ হয়েচে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেসবাই। নারাণ মাস্টার গিয়ে দেখেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁরপূর্ব-পরিচিত মি. কান্ওয়ার।

খুব খাতির করলেন তিনি। বললেন, তিনি জানেন না যে আসামি তাঁর ছেলে। খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন এ কথা শুনে।কেন এমন হল ?

নারাণ মাস্টার চুপ করে থাকেন। পরে নারাণবাবু সব বললেন।

দুঃখ করে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আমি জানি, এরকমই হয়। পণ্ডিতের বংশে পণ্ডিত ও সৎ ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো।

—আচ্ছা আমি চলি, বললেন নারাণবাবু।

মি. কান্ওয়ার বললেন—আপনি আমাকে Rural Bengal চিনিয়েছিলেন। প্রকৃত বাংলাদেশ কি তা আমাকে চিনিয়ে ছিলেন আপনি। আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আমি যদি জানতাম আসামি আপনার ছেলে, তাহলে ওকে কনভিকশন দিতাম না।বড়ই দুঃখিত আমি যে আমার অজ্ঞাতসারে আপনার ছেলের জেল হল। আমার বাসায় যাবেন না ! আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে বড় খুশি হবেন।

—এখন আমার সময় হবে না মি. কান্ওয়ার ! আমার স্ত্রী পুত্রের শোকে শয্যাগত। একা ফেলে রেখে এসেচি। আমায় আজই ফিরতে হবে।

—Really, I am so sorry !আপনার মতো ভালো লোকেরা সংসারে কষ্ট ভোগ করে কেন বলতে পারেন মি. গাঙ্গুলি ? আপনি তো একজন দার্শনিক।

—কর্মফল।

—আমার কি মনে হয় জানেন, এই দুঃখ-দহনের মধ্যে প্রভিডেন্স আপনাদের শেষ মালিন্যটুকু পুড়িয়ে খাঁটি নিষ্পাপ করে নিচ্ছেন। গ্যেটের ফাউস্টের সেই লাইন স্মরণ করুন—একদিন আসবেন, আপনার সঙ্গে বসে আমার বাংলোতে কথাবার্তা বলা যাবে। Goodbye !

নারাণবাবু বাড়ি এলেন।

মনোরমা সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—হ্যাঁগা, ছেলে কেমন আছে ?তাকে দেখলে ?

—দেখলাম। ভালো আছে—

—তাকে আনলে না কেন ?ঠিক বলো—তোমার মুখদেখে আমার ভালো মনে হচ্চে না—সে আছে তো ?

—নিশ্চয়ই আছে—আমার কথা বিশ্বাস কর।

হ্যাঁগো, তবে তাকে আনলে না কেন ? আমার বুকের এইখানটাতে হাত দিয়ে দ্যাখো। আমি থাকতে পারচি নে।

নারাণবাবু কিন্তু মুখ বুজে শুয়ে পড়ে থাকেন।

অসুস্থ স্ত্রীকে নারাণবাবু সত্যকথা বলতে পারেন না।নিজে সেবা করেন স্ত্রীর। স্ত্রী সেই অবস্থায় উঠে নিজে চা করেদিতে যান স্বামীকে। নারাণবাবু বাধা দেন।

একখানা চিঠি এল, ছেলে জেলের মধ্যে মনের ঘৃণায় আত্মহত্যা করেচে।

মি. কান্ওয়ার দুঃখ করে পত্র লিখেচেন।

নারাণবাবু গেলেন, পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন। মুখাগ্নি করলেন।

বাড়ি ফিরে এলে মনোরমা ব্যস্তভাবে বলেন—ওগো, খোকা আমার কাছে রাত্রে এসেছিল। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?বলো না ? সত্যি করে বল না ? কথা বল না কেন ?কি হয়েচে। প্রায় মিনতির সুরে বলেন—হ্যাঁগা, বলো না আমায় ?বলো না সে কেমন আছে ?

নারাণবাবু রোগশয্যাগত স্ত্রীকে নিজে বার্লি করে খাওয়ান।।

—দাঁড়াও, আমি নিজে উঠে তোমায় চা করে দিই—

—উঠো না, উঠো না। শুয়ে থাকো।

—হ্যাঁগা, ননী কেমন আছে ?খোকা কেমন আছে ? বলো না—

—ভালো আছে। তার চিঠি পেয়েছি। সে বাড়ি আসবে। এই দ্যাখো চিঠি। কান্ওয়ারের ইংরিজি চিঠিখানা নারাণ মাস্টারস্ত্রীর সামনে মেলে ধরেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাইরে থেকে ছেলেরা এসে হাঁক দেয়—স্যার, বাড়িআছেন ?

নারাণবাবু স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে যান বাইরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনি একদল গ্রাম্য বালকদের মধ্যে বসে ভূগোল ব্যাখ্যা করছেন—

পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিন ভাগ জল—